গ্রন্থ পর্যালোচনা

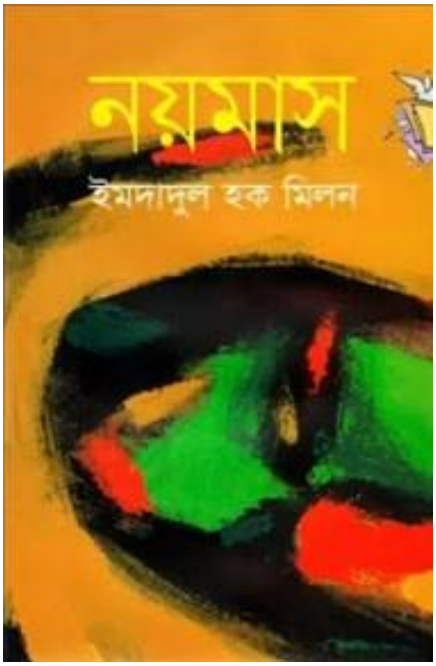

পর্যালোচনায়

সিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ফয়সাল

রোল নং- ২৫০০১৮

২৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, কক্সবাজার।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
লেখক পরিচিতি	৩
গ্রন্থ পরিচিতি	৪
ভূমিকা	৫
সার-সংক্ষেপ	৬
নামকরণের সার্থকতা	৮
সমালোচনা	৮
তুলনামূলক আলোচনা	৯
উপসংহার	৯

লেখক পরিচিতি

ইমদাদুল হক মিলন হলেন একজন প্রথিতযশা বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার। তিনি গল্প, উপন্যাস এবং নাটক এই তিন শাখাতেই জনপ্রিয় রচনা উপহার দিয়েছেন। কিশোর বাংলা নামীয় পত্রিকায় শিশুতোষ গল্প লিখে তার সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় 'সজনী' নামে একটি ছোট গল্প লিখে পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করতে শুরু করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০১৯ সালে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত করে। তিনি ১৯৫৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুরের মেদিনীমন্ডল গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুরের লৌহজং থানার পয়সা গ্রামে। তার বাবার নাম গিয়াসুদ্দিন খান এবং মার নাম আনোয়ারা বেগম। তিনি ১৯৭২ সালে লৌহজং উপজেলার কাজীর পাগলা হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯৭৪ সালে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৭৯ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকেই স্নাতক (সম্মান) সম্পূর্ণ করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২০০। অধিবাস, পরাধীনতা, কালাকাল, বাঁকাজল, নিরন্নের কাল, পরবাস, কালোঘোড়া, মাটি ও মানুষের উপাখ্যান, পর, কেমন আছ সবুজপাতা, জীবনপুর প্রভৃতি তার বিখ্যাত বই। তার লেখা দেড়শতাধিক নাটকের মধ্যে কোন কাননের ফুল, বারো রকম মানুষ, রূপনগর, যুবরাজ, কোথায় সেজন, আলতা, একজনা, নীলু, তোমাকেই, ছোছা কদম, আঁচল, খুঁজে বেড়াই তারে, কোন গ্রামের মেয়ে মেয়েটি এখন কোথায় যাবে, বিপুল দর্শকপ্রিয়তা পায়। কথাসাহিত্যে অনবদ্য অবদান রাখায় 'চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক' লাভ করেন। এছাড়া ২০০৬ সালে জাপান ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'তাকেশি কায়েকো মেমোরিয়াল এশিয়ান রাইটারস লেকচার সিরিজে' বাংলাভাষার একমাত্র লেখক হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাপানের চারটি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য এবং তার নিজের লেখা নিয়ে বক্তৃতা করেন। এশিয়ার লেখকদের জন্য এ এক বিরল সম্মান। পেয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার আইআইপিএম-সুরমা চৌধুরী মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদপত্র ‘কালের কন্ঠ’-এর সম্পাদক পদে নিয়োজিত রয়েছেন ।

গ্রন্থ পরিচিতি

বইয়ের নামঃ	নয়মাস
লেখকের নামঃ	ইমদাদুল হক মিলন
উৎসর্গঃ	আবুল মাল আবদুল মুহিত
প্রকাশকঃ	মনিরুল হক
প্রকাশনীঃ	অনন্যা
প্রথম প্রকাশঃ	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
প্রচ্ছদঃ	ধ্রুব এষ
অক্ষর বিন্যাসঃ	তন্বী কম্পিউটার
মুদ্রণঃ	পাণিনি প্রিন্টার্স
পৃষ্ঠাঃ	৯৬
মূল্যঃ	১৭৫.০০ টাকা

ভূমিকা

“নয়মাস” গ্রন্থটি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলনের এক অনন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আখ্যান। গ্রন্থটিতে লেখক মূলত গল্প বলতে চেয়েছেন। কেউ কেউ গ্রন্থটিকে সমকালীন উপন্যাস শ্রেণিতেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। দুটি ভিন্ন ভিন্ন গল্প নিয়ে এই উপন্যাস। প্রথম গল্পটি এক পাকিস্তানি কিশোরীকে নিয়ে, বাবা বাংলাদেশের একটি টেক্সটাইল মিলে কাজ করার সুবাদে যার বাংলাদেশেই বসবাস। একাত্তরে এ দেশে কী নৃশংসতা ঘটিয়েছিল পাকিস্তানিরা, মেয়েটি তার কিছুই জানতো না। প্রতিবেশী এক লেখক-সম্পাদক আংকেলের কাছে সব জেনে মেয়েটি তীব্র ঘৃণা বোধ করতে শুরু করে নিজের দেশ পাকিস্তানকে। বাংলাদেশের কাছে সে ক্ষমা চায় ও বাবা-মাকে বাধ্য করে তাকে নিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যেতে। দ্বিতীয় গল্পে মিনহাজ, স্বাধীনতার ছয় বছর পর থেকেই যে বাস করছে জার্মানিতে, কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে এলে দেখা করতে আসে পুরনো বন্ধুর সাথে। অনেকদিন বাইরে থেকে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে যেন অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল সে, মুক্তিযুদ্ধ যেন তার কাছে হয়ে গিয়েছিল রূপকথার এক গল্প। বন্ধুর কাছে শুনে, দুই-দুইজন বীরাঙ্গনাকে নিজের চোখে দেখে মিনহাজের চেতনায় আবার ফিরে আসে একাত্তর, ফিরে আসে বাংলাদেশ।

সারসংক্ষেপ

প্রথম গল্পটি (নয়মাস) একটি ১৩ বছর বয়েসী পাকিস্তানী মেয়ের। নাম যার মায়মুনা হায়দার খান। বাবা আশরাফ হায়দার খান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। বাতেন টেক্সটাইল মিলে চাকরি করেন। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ওদের বসবাস। বাঙালি ছেলেমেয়েদের সাথেও মায়মুনার ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে সে ভালবেসে ফেলেছে। কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, রাঙামাটি, বান্দরবন, সিলেট ইত্যাদি জায়গায় সে ঘুরেছে। এই সুন্দর দেশটা কেন পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেল? খুব জানতে ইচ্ছা করে তার। বাবা বলেছে বড় হলে সব জানতে পারবে। ক্রিকেট নিয়ে তার বেশ আগ্রহ। খেলতেও পারে বেশ। যেখানে ওরা বন্ধুরা মিলে ক্রিকেট খেলে তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন একজন লেখক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। খেলতে খেলতে বল ঐ ফ্ল্যাটে গেলে বল আনতে যায় মায়মুনা। পরিচয় হয় লেখকের সাথে। লেখকের ব্যবহারে আন্তরিকতার ছাপ ওকে আগ্রহী করে তোলে তার কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার জন্য। এই আগ্রহ লেখকের কাছে প্রকাশ করলে লেখক সুন্দর বর্ণনায় তার কাছে তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প। তিরিশ লক্ষ মানুষ হত্যা ও দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানীর গল্প শুনে হতভম্ব হয়ে যায় মায়মুনা। লেখক শুরু করেন ব্রিটিশ শাসনামল থেকে। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তানের জন্ম, ভাষা আন্দোলন, সেনা শাসন, বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯ এর গণ আন্দোলন, আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর, ৭০ এর নির্বাচন, জুলফিকার আলী ভুট্টোর মন্ত্রণা, ইয়াহিয়া খানের একগুঁয়েমি সবকিছু সংক্ষেপে বলার পর শুরু করলেন মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী। ১৯৭১ সালের ২৫ এ মার্চ রাতের অপারেশন সার্চলাইট নামক ইতিহাসের নিকৃষ্টতম হত্যাযজ্ঞয়ের ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকান্ড, সংখ্যালঘুদের উপর পৈশাচিক নির্যাতনের ঘটনা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মায়মুনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক রচিত বর্বচিত ঘটনাগুলো একে একে শোনাতে থাকলেন লেখক। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, খুলনার ডুমুরিয়ার ঘটনাগুলো যেন লেখকের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখক শোনালেন ভাগীরিথী নামক এক হিন্দু বিধবার কথা যাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা দুই জিপে দুই পা বেধে কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলেছিল। অসংখ্য নারীর সম্ভ্রমহানীর গল্পও লেখক শোনালেন। একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল মায়মুনা। প্রচন্ড লজ্জায় সে আর মাথা তুলতে পারছে না। সে সিদ্ধান্ত নিলো কোন বাঙালিকে সে আর তার মুখ দেখাবে না। বাসায় গিয়ে সে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার জিদ ধরলো। এবং একপর্যায়ে তার বাবা মা তার জিদের কাছে হার মানে এবং পাকিস্তানে ফিরে যায়। যাবার আগে লেখকের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানি জাতির সন্তান হিসেবে ক্ষমা চাই মায়মুনা।

দ্বিতীয় গল্পের নাম ঘা। যেখানে অনেক বছর পর লেখকের সাথে দেখা হয় তার প্রিয় বন্ধু মিনহাজের। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। মিনহাজ জার্মানিতে থাকে। দেশে এসেছে ভাইয়ের অপারেশনের খবর পেয়ে। বন্ধুকে সারপ্রাইজ দিতে সে ফোন না করেই চলে এসেছে। এরপর দুজনে শুরু করে গল্প। জার্মানিতে যাওয়া, সেখানকার জীবন-সংসার, ছেলে-মেয়েদের অবস্থা ইত্যাদি। গল্পের মধ্যেই রাসু কর্মকার নামী এক হিন্দু মহিলা লেখকের সাথে দেখা করতে আসে। লেখক তাকে মাসিক সাত হাজার করে টাকা দেন। চিকিৎসার জন্য দেয়া টকা হতে তিন হাজার টাকা বেঁচে যাওয়ায় ফেরত দিতে এসেছেন। মহিলা চলে যাওয়ার পর মিনহাজ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে সে একজন বীরাঙ্গনা। আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে মিনহাজ। মহিলার ঘটনা জানতে উদগ্রীব হয় মিনহাজ। লেখক শোনায় যে, ৭১ সালে রাসুর বয়স ছিলো ১৪। পাকিস্তানি সৈন্যরা তার স্বামীকে হত্যা করে, তাকে ধর্ষন ও নির্যাতন করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ডেরা থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেও যুদ্ধের পর তার আশ্রয় হয়নি কোথাও। এখন সে ছোট ভাইয়ের সংসারে থাকে। এরপর লেখক মিনহাজকে বলেন আর একজন বীরাঙ্গনার গল্প যার নাম রওশন আরা। স্বামী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় তাকে ও তার মেয়ে কে ধর্ষন করে পাকিস্তানি সৈন্যরা । মেয়েটি মারা গেলেও বেঁচে আছে রওশন আরা। এখন ভিক্ষা করে চলে তার সংসার। রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে কথা গুলো শুনতে থাকে মিনহাজ। পরদিন ঐ রিকশাওয়ালা যার নাম রমজান আসে লেখকের কাছে আর একজন বীরাঙ্গনার গল্প শোনাতে যে এখনো জীবন বাঁচাতে যদ্ধ করছে। নাম তার তাজবিবি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষন করে। তার পায়ুপথ ও গোপন অঙ্গ ছিঁড়ে এক হয়ে যায়। যুদ্ধের পর নয় বার অপারেশন হয় তার। ডাক্তাররা তার পায়ুপথ ও যৌনাঙ্গ সেলাই করে বন্ধ করে দিয়েছে। পেটের নিচের দিকে একটা নল লাগিয়ে দিয়েছে যা দিয়ে পেশাব পায়খানা করে। মুক্তিযুদ্ধের পর কেউ তাকে আশ্রয় দিতে চাইলো না। কিন্তু তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ না সাথে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। তার স্বামীই তার যাবতীয় সেবা যত্ন করেন। রান্না করে খাওয়ান। রমজানের কথা শুনে লেখক ও মিনহাজ উতলা হয়ে ওঠে তাজবিবি ও তার স্বামীকে দেখার জন্য। রমজানের সাথে তারা তাজবিবির বাসায় যায় এবং জানতে পারে রমজানই তাজবিবির স্বামী। তাজবিবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় “স্বাধীনতা পাইতে গেলে মরতে হয়, রক্ত দিতে হয়, ইজ্জত দিতে হয়। আমিও দিছি, আমার কোন দুঃখ নাই।” তার কথা শুনে কেঁদে ফেলে মিনহাজ। ক্ষমা চাই তার কাছে তাদের জন্য এতদিন কিছু না করতে পারার জন্য। পরিশেষে তাজবিবি ও রমজানের জন্য বাড়ি করে দেয়া ও তাদের সংসার চালানোর দায়িত্ব নেয় মিনহাজ।

নামকরণের সার্থকতা

গ্রন্থটির প্রথম গল্পের নাম নয়মাস অনুসারে গ্রন্থটির নাম নয়মাস। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কে কেন্দ্র করেই আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থটিতে ফুটে উঠেছে নয় মাস ব্যপী যুদ্ধের ভয়াবহতা, অত্যাচার, নির্যাতনের বিভৎস কাহিনী। পাশাপাশি যে সকল মা-বোন তাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমাদেরকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছেন তাদের করুণ ইতিহাস। তাজিবিবি, রওশন আরা, রাসু কর্মকারের মত অসংখ্য মা-বোন এখনো বয়ে বেড়াচ্ছেন সেই ভয়ঙ্কর নয় মাসের স্মৃতি। নয় মাসের এক যুদ্ধ যা আমাদের দিয়েছে বিশ্বের বুকে স্বাধীন অস্তিত্ব। তবুও আমরা ভুলে আছি আমাদের ইতিহাস, পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই লেখক বইটির নাম দিয়েছেন নয় মাস। তাই বলা যায় বইটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

সমালোচনা

বইটিতে লেখক সহজ ভাষায় সংক্ষেপে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভৎসতার চিত্র এঁকেছেন। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করায় লেখকের লক্ষ্য। তিনি তার কাজে সফলতার ছাপ রেখেছেন। বাঙালি কিশোর-কিশোরীদের জন্য বইটি অবশ্য পাঠ্য। তবে বইটি না উপন্যাসের মর্যাদা পাবে, না পাবে ছোট গল্পের মর্যাদা। বইটির লেখক আর গল্পের লেখক যে একই ব্যক্তি তা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। বইটিতে লেখক কোন উপন্যাস বা গল্প না লিখে পাঠকদের গল্প শোনাতে চেয়েছেন এবং তা সফলতা পেয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে বিভৎস দিকটি আড়ালে পড়ে ছিল, লেখক সেটিকে সামনে এনেছেন দারুণভাবে।

তুলনামূলক আলোচনা

ইমদাদুল হক মিলনের “নয়মাস” গ্রন্থটির সাথে মিল রয়েছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখিকা ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম এর “আমি বীরাঙ্গনা বলছি” বইটির। দুটি গ্রন্থেই ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো নারীদের করুণ কাহিনী। আমি বীরাঙ্গনা বলছি বইটির মেহেরজান, মিনা, ফাতেমার মত নয়মাস বইটির রাসু কর্মকার, রওশন আরা, তাজবিবিও মুক্তিযুদ্ধের বিভৎসতার শিকার এবং একই ভাবে যুদ্ধ পরবর্তী দুঃসহ জীবন যাপনে বাধ্য। আমাদের সমাজ তাদেরকে কখনো ভুলে থেকেছে, কখনো অপমান করেছে, কখনোবা বিতাড়িত করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা সম্মান পেলেও বীরাঙ্গনাদেরকে কেউ সম্মান প্রদর্শন করেনি। তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে তারা মুক্তিযুদ্ধের পরও বাচার জন্য এখনো যুদ্ধ করে যাচ্ছে। দুটি গ্রন্থই নতুন প্রজন্মকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য বীরাঙ্গনাদের অবদান।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় “নয়মাস” ইমদাদুল হক মিলনের একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সার্থক লেখনি। গল্পের ছলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন সুনিপুণ ভাবে। পাশাপাশি বীরাঙ্গনাদের জন্য অবদান রাখতে নতুন প্রজন্মকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। লেখক প্রত্যাশা করেছেন ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন বীরাঙ্গনাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলে না যায়।